†kL nwmbv GLbI †e‡P Av‡Qb AvBwf ingvb evP‡Z cv‡ibwb| evP‡Z cvi‡jb bv

kvn GGgGm wKewiqv Amnvq gvbl, wecb †`k... ck GLb GKUvB

†K cieZx Uv‡MU

অনিরুদ্ধ ইসলাম

আইভি রহমানের পর শাহ এ এম এস কিবরিয়া। এরপর কে? ক্ষণ গণনা চলছে। এটাই এখন বাংলাদেশের চিত্র।

একুশে আগস্টের পর পাঁচ মাস না পেরুতেই আবার গ্রেনেড হামলা। এবার শিকার হলেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া এবং তার সঙ্গে থাকা আরও পাঁচজন। হবিগঞ্জের বৈদ্যেরবাজারে কর্মী ও এলাকার জনগণের সঙ্গে ঈদ পুনর্মিলনীতে গিয়েছিলেন তিনি। সেই রাতেই তার ঢাকা ফিরে আসার কথা ছিল। বাসার জন্য বাজার থেকে টাটকা শাক-সবজি কিনিয়েছিলেন। তিনি নিজে হয়তো ধারণা করেনি এ ধরনের একটি নির্বিরোধী জনসভায় কোনো ধরনের হামলা হতে পারে। তাহলে সন্ধ্যার পর ঐ সভা চলত না। তিনি নিজে হয়তো ধারণা করেননি, কিন্তু প্রশাসন কি করেছে? সিলেট এমনিতেই পরিচিতি পেয়েছে গ্রেনেড-বোমার নগরী হিসেবে। গত কিছুদিন ধরে সিলেটে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেই চলেছে। কিন্তু তারপরও এ ধরনের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যেখানে সভা করতে গেছেন সেখানে সামান্যতম নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। বিরোধী দল সম্পর্কে ক্ষমতাসীনদের যে মনোভাব তাতে প্রশাসনের মনে এ ধরনের একটি ধারণা জন্মেছে, বিরোধীদলে যারা রয়েছে তাদের রাষ্ট্র ও সমাজে কোনো গুরুত্ব নেই। আর সে কারণেই কিবরিয়ার সভার ব্যাপারে কোনো নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। তিনি গ্রেনেড হামলায় গুরুতর আহত হবার পরও স্থানীয় ডাক্তাররা তাকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রাথমিক উদ্যোগ নেয়নি। যে অ্যাম্বুলেন্সে করে তাকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে, রাস্তায় তার তেল ফুরিয়ে গেছে এবং তেল সংগ্রহের জন্য অ্যাম্বুলেন্সটিকে দীর্ঘক্ষণ রাস্তায় অপেক্ষা করতে হয়েছে।

আহত কিবরিয়াকে চিকিৎসা দেয়ার ব্যাপারে প্রশাসনিক এই গাফিলতির কোনো উত্তর নেই। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর একটি বক্তব্য বিতর্ক-বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। কিবরিয়াকে হেলিকপ্টারে ঢাকায় নিয়ে আসার ব্যাপারে প্রশাসন থেকে উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল বলে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্যের বরাত দিয়ে সংবাদ ছাপা হয়েছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব অথবা তার পরিবারের কেউ বলতে পারেন না যে কার সঙ্গে তারা যোগাযোগ করেছিলেন। প্রশাসনও সেটা নির্দিষ্টভাবে বলতে পারেনি। এতে বোঝা যায়, বিরোধীদলের এ ধরনের একজন ব্যক্তির ওপর আক্রমণ চললেও তাতে সরকার বা প্রশাসনের কিছু আসে-যায় না। দায়-দায়িত্বহীনতা আর কাকে বলে!

গ্র্যানেড হামলায় নিহত কিবরিয়ার লাশ নিয়ে শোক মিছিল

শাহ এ এম এস কিবরিয়ার ওপর গ্রেনেড হামলার প্রেক্ষিত হিসেবে এ ধরনের একটি পরিবেশের কথা উল্লেখ করেছেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূতরা। তারা বলেছেন, ইতিপূর্বের এ ধরনের গ্রেনেড হামলা ঘটনার তদন্ত হয়নি বলেই হামলাকারীরা স্বচ্ছন্দে এ ধরনের কাজ করতে পেরেছে। উল্লেখ্য, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূতদের মুখপাত্র হয়ে যিনি এ কথা বলেন সেই ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী সিলেটের শাহজালাল মাজারে নামাজ আদায় করে ফেরার পথে এ ধরনের গ্রেনেড আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন। কিন্তু তার ওপর এই গ্রেনেড হামলার তদন্তের কোনো ফলাফল প্রকাশ করা হয়নি। ব্রিটেনের স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড ঐ হামলার তদন্তের ব্যাপারে সহযোগিতা দিয়েছিল। তারা তাদের তদন্ত রিপোর্টও পুলিশকে দিয়েছে। কিন্তু ঐ ঘটনাসহ এ ধরনের গ্রেনেড হামলার তদন্তে পাওয়া কোনো তথ্যই সরকার প্রকাশ করেনি। বিএনপির মহাসচিব এ এম এস কিবরিয়া হত্যার ঘটনায় সরকারি দলের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে যে প্রেস ব্রিফিং করেছে তাতে অবশ্য স্বীকার করেছেন যে প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণেই হয়তো এসব হামলাকারীদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি বর্তমান ঘটনা সম্পর্কে বলেন, একজন ডিআইজিকে এ ঘটনার তদন্ত করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। পুলিশের সঙ্গে এ ঘটনার তদন্তে র‍্যাবকেও নিয়োগ করা হয়েছে। র‍্যাবের বোমা বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞরা অকুস্থল পরিদর্শন এবং পুলিশের উদ্ধারকৃত লিভার, স্প্লিন্টার পরীক্ষা করে বলেছে যে এটা গ্রেনেড হামলা ছিল এবং এ ধরনের গ্রেনেড সামরিক বাহিনী ব্যবহার করে থাকে। র‍্যাবের যে ক্যাপ্টেন এই তদন্তে গিয়েছিলেন তার মতে, খুব ভালোভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া এ ধরনের টার্গেট হিট করা সম্ভব নয়। তবে বিশেষজ্ঞদের এই ভাষ্য পাওয়ার আগেই হবিগঞ্জের ডিসি ও বিটিভি সবজান্তার মতো একে বোমা হামলা বলে চালিয়ে দিতে চেয়েছে। সম্ভবত এভাবে তারা ঐ হামলার ঘটনাকে খাটো করে দেখাতে চেয়েছে। এদের আচরণ দেখে মনে হয় যে বিরোধী দলের সমাবেশে এ ধরনের হামলা যে কোনো গুরুত্ব বহন করে সেটা তারা মনেই করেননি। একুশে আগস্টে বিরোধীদলীয় নেত্রীর জনসভায় গ্রেনেড হামলার পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষও একই ধরনের আচরণ করেছিল। প্রশাসনের রাজনীতি ও দলীয়করণ জনজীবনের জন্য কি দুর্ঘটনা নিয়ে আসে এই ঘটনাবলী তার প্রমাণ। বিরোধী দলনেত্রী তো ক'দিন আগে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, আবার প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন। সাবেক অর্থমন্ত্রী কিবরিয়া সাহেব বেঁচে থাকলে সেই সম্ভাবনা থাকত। তাদের ক্ষেত্রেই যদি এ ধরনের আচরণ হয় তাহলে সাধারণ নাগরিকের নিরাপত্তার বিষয়টিকে এরা কি দৃষ্টিতে দেখেন সেটা অনুমেয়।

বাংলাদেশের নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ এ এম এস কিবরিয়াকে জীবিত থাকতে কোনো নিরাপত্তা না দিলেও তার মৃত্যুর পর আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে তার লাশ সবার শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য রাখা হয়েছিল, তার নিরাপত্তার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ঐখানে যখন তার লাশ রাখা ছিল তখন র‍্যাবের সদর দপ্তরের নির্দেশে র‍্যাবের একটি স্কোয়াড আওয়ামী লীগ ভবনের আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের অফিস ডগ্ স্কোয়াড দিয়ে তন্ন তন্ন করে তল্লাশি করে। সে জন্য তারা সেখানে উপস্থিত দলীয় নেতাদের কোনো অনুমতি নেয়নি। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তারা জনায় যে, সন্দেহ হলে যেকোনো জায়গায় তারা তল্লাশি করতে পারে। এর জন্য কোনো অনুমতির প্রয়োজন পড়ে না। বাংলাদেশের আইন বলছে, এ ধরনের তল্লাশির জন্য সার্চ ওয়ারেন্ট লাগবেই এবং ঐ তল্লাশির সময় নিরপেক্ষ সাক্ষীর উপস্থিতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। র‍্যাবের এই আচরণ সবার মনে বিস্ময় ও ক্ষোভের উদ্রেক করলেও র‍্যাবের সদস্যরা সাংবাদিক অথবা অন্যদের প্রশ্নের ব্যাপারে একেবারেই ড্যাম কেয়ার ছিলো। পুলিশের ক্ষেত্রেও কিবরিয়া সাহেবের শব বহনকারী মিছিলের অগ্রভাগে গাড়ি নিয়ে যাওয়ার ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে দেখা গেছে। ফল যা হবার তাই হয়েছে। ক্ষুব্ধ কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে। কয়টা নির্দোষ ব্যক্তির গাড়ি পুড়েছে।

গ্রেনেড হামলায় শাহ এ এম এস কিবরিয়ার ঘটনা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রে যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ। কিবরিয়া পেশাগতভাবে একজন কূটনীতিক ছিলেন এবং সে অনুসারে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন পদে কূটনৈতিক দায়িত্ব পালন করেছেন। জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি হিসেবে প্রায় এক দশক তিনি এসকাপের নির্বাহী পরিচালক ছিলেন। পরবর্তীতে অবসর নিয়ে রাজনীতিতে যোগ দিলে অর্থমন্ত্রী হিসেবে তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা, দাতা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। এ কারণে তার এ ধরনের মৃত্যুকে আন্তর্জাতিক মহল সহজভাবে নেয়নি।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শাহ এ এম এস কিবরিয়াকে হত্যার এই ঘটনা যে প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করুক, তাতে সরকার এখনও বিশেষ বিচলিত নয়। তবে জাতীয় ক্ষেত্রে এ ঘটনার প্রতিক্রিয়া যে রাজনৈতিক অভিঘাত সৃষ্টি করেছে তা সার্ক প্রস্তুতির ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে সমস্যার সৃষ্টি করবে। সরকারি মহলও সেটাই মনে করছে। হবিগঞ্জ হত্যাকান্ডের ঘটনায় বিরোধীদলগুলো থেকে ইতিমধ্যে ৬০ ঘন্টার হরতাল করেছে। হরতালকে সরকার কঠোর হাতে মোকাবেলা করতে যাওয়ায় সহিংসতা বেড়েছে।

রাজনৈতিক অঙ্গনে হত্যাকান্ডের পরিপ্রেক্ষিতে সবচেয়ে বড় যে ঘটনাটি ঘটেছে তা হলো বিরোধী আন্দোলনে পুনঃ ঐক্যবিধান। ইতিপূর্বে ৩০ ডিসেম্বর গণঅনাস্থা প্রাচীর কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে এগারোদলের সিপিবি ঐ আন্দোলন থেকে নিজেদের কিছুটা গুটিয়ে নিয়েছিল। আওয়ামী লীগের সঙ্গে এক মঞ্চ থেকে জনসভা করবে না বলে তারা সুনামগঞ্জ ও মংলার প্রস্তুতিমূলক জনসভায় অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল। ৩০ ডিসেম্বর পরবর্তী আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণের ব্যাপারে সিপিবি রাজি না হওয়ায় এগারো দল সিপিবিকে বাইরে রেখেই আওয়ামী লীগ, জাসদ, ন্যাপ (মোঃ)সহ যুগপৎ আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। এর ফলে এগারো দল ও যুগপৎ আন্দোলনের যে ধারা সূচিত হয়েছিল তাতে সংকট সৃষ্টি হয়। নিজ দলের কেন্দ্রীয় কমিটি ও দলের বাইরে তীব্র সমালোচনার মুখে সিপিবি পুনরায় যুগপৎ আন্দোলনে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেও এর পূর্বে সৃষ্টি হওয়া ঐ সংকট দূর হচ্ছিল না। এ এম এস কিবরিয়া হত্যার ঘটনা এগারো দল ও যুগপৎ

আন্দোলনের আওয়ামী লীগ, জাসদ, ন্যাপ (মোঃ) পুনরায় আন্দোলনের কর্মসূচিতে ঐকবদ্ধ হয়েছে।

আন্দোলনকারী এসব রাজনৈতিক দল মনে করছে যে যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়। এখন অল আউট ইকোর্ট নিতে হবে। তবে বিরোধী দলগুলো এ ধরনের মনোভাব নিলেও বাস্তবে তারা জনগণকে আন্দোলনে কতখানি সম্পৃক্ত করতে পারবে এ নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। আন্দোলনকে সেভাবে দানা বাঁধানো যাচ্ছে না।

শেখ হাসিনাও আন্দোলন নিয়ে কি করতে চান সেটা বোঝা যাচ্ছে না। একুশে আগস্টের ঘটনার পর তিনি নিজেই আন্দোলনের রাশ টেনে ধরেছিলেন। সে সময় চিকিৎসার কথা বলে এক মাসের অধিক সময় তিনি যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। সেখানে তার চেষ্টা ছিল মার্কিন প্রশাসনকে প্রভাবিত করে কিছু করা যায় কিনা। আপাত দৃষ্টিতে তিনি সে ব্যাপারে ব্যর্থ হয়েছেন। মার্কিন প্রশাসনের কেউ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্যন্ত করেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জামায়াতের ব্যাপারে তাদের আগ্রহ আরও বাড়িয়েছে।

দেশে ফিরেও শেখ হাসিনা ধারাবাহিকভাবে আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে সে ধরনের কোনো ভূমিকা নেননি। বরং হঠাৎ হঠাৎ দেয়া কর্মসূচি দিয়ে জনগণের বিরক্তি উৎপাদন করেছেন। জোট সরকার কৃষি মৌসুমের সময় ডিজেলের মূল্য লিটারপ্রতি তিন টাকা বৃদ্ধি করে বেশ কিছুটা নার্ভাস অবস্থায় ছিল। আন্দোলনের আশঙ্কায় তারা কৃষির জন্য সেচের ক্ষেত্রে ভর্তুকি দেয়া হবে বলে ঘোষণা করে। কিন্তু যেখানে পাশের দেশ ভারত ও নেপালে ডিজেলসহ জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে ব্যাপক আন্দোলনে সরকারকে পিছু হটতে হয়েছে, সেখানে শেখ হাসিনা যুবলীগকে দিয়ে হঠাৎ করে ডাকা হরতালে ঐ আন্দোলনের সম্ভাবনা শেষ করে দেন। সার্ক শীর্ষ সম্মেলনকে মাথায় রেখে ৮ ফেব্রুয়ারির ডাকা হরতালও আন্দোলনের জন্য ব্যুমেরাং হয়েছে। এবারও এ এম এস কিবরিয়া হত্যার ঘটনা ব্যাপক সহানুভূতির সৃষ্টি করলেও সার্ক শীর্ষ সম্মেলনকে সামনে রেখে তার আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করার প্রবণতায় সেই সুযোগকে কাজে লাগানো যাবে বলে মনে হয় না। এতে বিরোধীদলের সদিচ্ছা সম্পর্কে জনমনে প্রশ্ন সৃষ্টি হবে। এ ধারণা আন্দোলনের কর্মসূচিতে ঐক্যবদ্ধ অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দেরও। আর সরকারি দল এখানেই ভরসা করছে। তারা বিরোধীদলের এ ধরনের মতভিন্নতাকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক অতীতেও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। এবারেও তারা সে ব্যাপারে আশাবাদী। তবে একুশে আগস্টের মতো এবারও যদি হবিগঞ্জের ঘটনাকে হজম করে ফেলা যায় তবে সামনে আর সহসা কোনো আন্দোলন তোলা যাবে না বলেই অনেকে মনে করেন।

শহ এ এম এস কিবরিয়ার ওপর এই হামলার ঘটনাকে অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক শক্তি এবং মুক্তিযুদ্ধে ধারাবাহিকতা নস্যাৎ করার নীলনকশা অনুযায়ী 'টার্গেট কিলিং' বলেই মনে করছে রাজনৈতিক অভিজ্ঞমহল। উদীচী থেকে শুরু করে একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলার ঘটনার ধারাবাহিকতায় হবিগঞ্জে কিবরিয়ার ওপর এই গ্রেনেড হামলা চালান হয়। এর আগে জনসভা সমাবেশ, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যাত্রা প্যান্ডেলে এসব হামলা হয়েছে। এভাবে এক ধরনের ভীতির ও আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা হয়েছে সারা দেশে। ঐসব ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটিত না হওয়ায় জনমনে স্বাভাবিক এই ধারণা সৃষ্টি হয়েছে এর পেছনে যে অপশক্তি ক্রিয়াশীল তারা অপ্রতিরোধ্য। সরকার, প্রশাসন, সেনাবাহিনীর মধ্যে তাদের শক্ত অবস্থান রয়েছে। পরবর্তীতে এসব হামলার টার্গেট করা হয়েছে ব্যক্তি মানুষকে। সুনামগঞ্জে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, সিলেটে মেয়র বদরুদ্দিন কামরান, শাহজালাল মাজারে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত আনোয়ার চৌধুরী ও একুশে আগস্ট বিরোধী দল নেত্রী শেখ হাসিনা এই 'টার্গেট কিলিং'-এর লক্ষ্যবস্তু হয়েছিল। এবার হবিগঞ্জে হয়েছেন কিবরিয়া। অন্যরা পরের জীবনের ওপর দিয়ে বেঁচে গেলেও কিবরিয়া বাঁচতে পারলেন না। এবারের গ্রেনেড হামলার কোনো তদন্ত বা বিচার হবে বলে কিবরিয়ার পরিবারসহ কেউ বিশ্বাস করেন না। ঐ ঘটনার পেছনের অপশক্তির হাত প্রশাসনের এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত যে, লোক দেখানো তদন্ত তারা করে তাও কিছুদূর চলে ধামাচাপা পড়ে যায়। এবারও হবিগঞ্জের ঘটনার একই পরিণতি হবার সম্ভাবনা। তদন্তের নামে 'আইওয়াশ' আমাদের সব সময়ের ঘটনা। তাতে এখন যোগ হয়েছে ভিন্নমাত্রা। যেকোনো বড় ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে বলা হচ্ছে বিদেশী তদন্তের কথা। আন্তর্জাতিক তদন্তের নামে ইন্টারপোল, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড বা এফবিআইয়ের নিম্নস্তরের দু'একজন বাংলাদেশে আসছেন। পাঁচতারকা হোটেলে কিছুদিন অবস্থান করে আবার ফিরে যাচ্ছেন। কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। ধারাবাহিক আইওয়াশ চলছেই।

রাজনৈতিক মহলসহ অভিজ্ঞ সকল মহলের ধারণা যে, সশস্ত্র সাম্প্রদায়িক যে অপশক্তি বাংলাদেশে বিশেষভাবে সক্রিয় রয়েছে তারাই এসব ঘটনার পেছনে রয়েছে। রাজনৈতিকভাবে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের ছত্রছায়া তারা পাচ্ছে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের জঙ্গি গ্রুপগুলোর সঙ্গে এদের পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই'র মাধ্যমে গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। এসব জঙ্গি গ্রুপগুলোর কাছ থেকেই এরা অস্ত্র ও গোলাবারুদ পেয়ে থাকে। চট্টগ্রামে চোরাচালান করে আনা যে অস্ত্রের মধ্যে যেসব অস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায়নি সেগুলো এসব গোষ্ঠীর হাতে পৌঁছেছে। চট্টগ্রামের ঐ অস্ত্র চালানে যে গ্রেনেড পাওয়া গেছে তার সঙ্গে ঢাকা ও সিলেটের হামলায় ব্যবহৃত গ্রেনেডের মিল পাওয়া গেছে। একটু যত্ন নিয়ে তদন্ত করলেই এসব গ্রেনেড হামলার অস্ত্রের উৎস সম্পর্কে না জানতে পারার কোনো কারণ নেই। পক্ষান্তরে ঢাকা ও সিলেট-হবিগঞ্জ সকল ক্ষেত্রেই এসব গ্রেনেড হামলার পেছনে প্রশিক্ষিত হাত কাজ করছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর জন্য এসব ব্যক্তিকে দেশের অভ্যন্তরে বা বাইরে বিশেষ ট্রেনিং নিতে হয়েছে। এসবও খুঁজে পাওয়া সম্ভব। নির্ভর করে সরকারের রাজনৈতিক ইচ্ছার ওপর। এ ব্যাপারে সরকারের যেকোনো সদিচ্ছা নেই একুশে আগস্টের ঘটনা নিয়ে ক্ষমতাসীন মন্ত্রী, এমপি, এমনকি খোদ প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য তার প্রমাণ।

আসলে বাংলাদেশকে ঘিরে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা, তার মুক্তিযুদ্ধের অর্জনসমূহ ঘিরে গভীর ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। একাত্তরে পরাজিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিপক্ষ এর পেছনে রয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আন্তর্জাতিক পরিসরে এতদাঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী রণকৌশল ও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও লুটপাটের মহোৎসবে লিপ্ত সিন্ডিকেট। সব মিলিয়ে বাংলাদেশ এক গভীর অনিশ্চয়তার পথে। কিবরিয়া, আইভী রহমান, আহসানউল্লাহ মাস্টাররা সেই অনিশ্চয়তার রাজনীতির বলি। বাংলাদেশকে তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে এর প্রতিরোধে গর্জে উঠতে হবে। চলমান আন্দোলনের মাঝে সেই গর্জনের আভাস পাওয়া গেলেও তাতে বর্ষণের বিশেষ আশ্বাস পাচ্ছে না দেশের মানুষ। একের পর এক হরতাল দেখছে মানুষ। সন্দেহ নেই এই হত্যাকান্ডের সঠিক তদন্ত হোক, কঠোর শাস্তি হোক অপরাধীদের- এটা সবাই চায়। কিন্তু দেশের মানুষ হরতাল চায় না। চায় বিকল্প জোরালো কর্মসূচি। যেমন বিরোধী দলের মানববন্ধনে মানুষ সম্পৃক্ত হয়েছিল। এ ধরনের কর্মসূচির প্রতি কেন যেন বিরোধী দলের আগ্রহ কম।

সাধারণভাবে পরিচিতিতে বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। মুরব্বিদের কেউ কেউ বলেন, মধ্যপন্থি আধুনিক মুসলিম দেশ। এটা ছাপিয়ে এখন জঙ্গি ইসলামী মেওলবাদী চাপ লাগছে বাংলাদেশের গায়ে। বাংলা ভাইরা এই পরিচিতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। তারচেয়ে বড় ভূমিকা রাখছে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার। এক অদ্ভুত কারণে শক্তিশালী বিএনপি অতিষ্ঠ হয়ে পড়ছে জামায়াত দ্বারা। যে কারণেই ঘটছে গ্রেনেড-বোমার বিস্ফোরণ। মরছে আইভি রহমান, আহসানউল্লা মাস্টার, কিবরিয়ারা। এরপর কার কথা লিখতে হবে আমরা ব্যস্ত সেই হিসাব নিয়ে...।